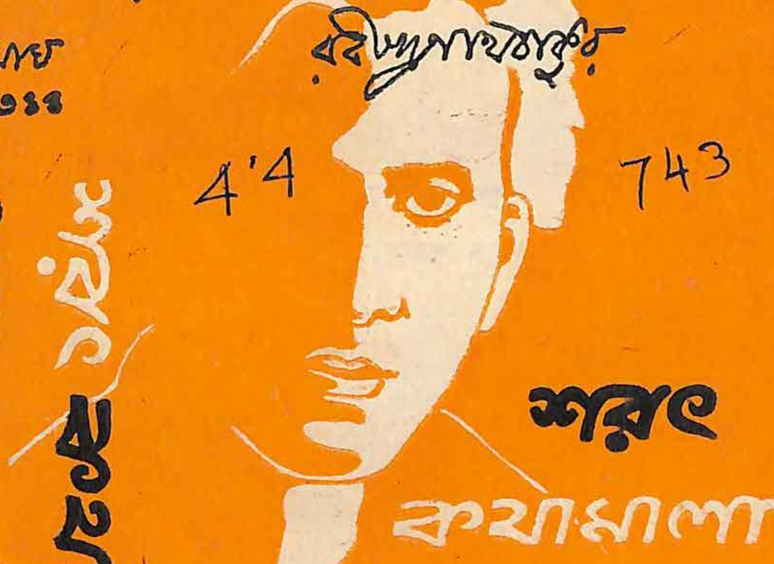
শরৎচন্দ্র

যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে,
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি'
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি'॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাঘ
১৩৪৪

4'4 743



শরৎ
কথামালা

শরৎ কথামালা

শরৎ জন্মশতবর্ষে বাঙলা ভাষাভাষী কিশোর-কিশোরীদের

শরৎ কথামালা

পঞ্চম শ্রেণী (দ্রুত পঠন)

মনোজ দত্ত
শান্তিলতা দাস

এন. ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
১৩, কলেজ রো
কলি-৯

এন. ভট্টাচার্য এণ্ড কোং-এর পক্ষে শ্রীললিতকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক
১৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত

নূতন সংস্করণ : মার্চ, ১৯৮৯

দাম : আট টাকা মাত্র

শ্রীদুর্গা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্-এর পক্ষে অন্নপূর্ণা পাল কর্তৃক
১৬, রমাপ্রসাদ রায় লেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত।

—বিষয়-সূচী—

ন্যাড়ার চিড়িয়াখানা

ওকে সবাই ন্যাড়া বলে ডাকে।

তখন সে ছোট্ট খোকা। গোটা কয়েক ফোড়া হয় মাথায়। তাই মাথার চুলগুলো সব উঠে যায়। তখন থেকেই ঠাকুমা আদর করে ডাকেন—ন্যাড়া।

এই ন্যাড়ার ভারি শখ গাছের ডাল থেকে ফড়িং ধরা। ফড়িং ধরে এনে সে পোষে। শুধু কি ফড়িং!

রঙ-বেরঙের প্রজাপতি, পোকামাকড় সবকিছু ধরতেই সে ওস্তাদ! বেড়াল আছে। বেজিও আছে একটি। পথ থেকে কুড়িয়ে এনেছে নেড়ি কুকুরের বাচ্চাটা। এইসব নিয়েই ন্যাড়াচন্দ্রের চিড়িয়াখানা।

চিড়িয়াখানায় কোন পাখি নেই। তাই ন্যাড়া পাখির খোঁজে ঘুরে বেড়ায় বনে-বাদাড়ে। ন্যাড়ার কপাল ভাল। একদিন একটা শালিক-ছানা পাওয়া গেল। শালিক ছানাটি তেমন উড়তে পারে না। তাই ন্যাড়া ধরতে পেরেছে।

বাড়িতে কোন্ যুগের একটা খাঁচা ছিল। সেটাকেই ঠিকঠাক করে শালিকটাকে পুরে রাখল।

তার কী আদর! তাকে খাওয়ানোর জন্য ধান চাল ছোলা কলা পেয়ারা কত কি সব এসে গেল।

পাখিটা কিন্তু ভারি বেয়াড়া। কিছুতেই কিছু মুখে দেয় না। তবে কি ঠোঁট ধরে খাইয়ে দিতে হবে—ন্যাড়াচন্দ্র ভাবে।

খাবে কি! আসলে ওর ভীষণ মন খারাপ। তার মা নেই কাছে। খুব ভয় পেয়েছে সে।

ইতিমধ্যে মা-শালিক এসে ন্যাড়াদের ঘরের চালে বসল। কিচির-মিচির করে কি যেন সে বলতে লাগল ছানাটিকে। সেও তখন তার মায়ের দিকে চাইছে। আর শুধু ঠোঁট নাড়ছে।

সব দেখেশুনে বড় মায়া হল ন্যাড়ার। নিজের মায়ের কথা মনে পড়ল তার। ভাবল মনে মনে—মায়ের কাছ থেকে দূরে গেলে তারও তো এমনি মন খারাপ করে, কান্না পায়। ন্যাড়ার চোখ দুটো জলে ভরে এল।

না, এমনি করে ওকে দুঃখ দেওয়ার মানেই হয় না। খাঁচার দরজাটা খুলে দিল ন্যাড়া। অমনি ফুড়ুত করে উড়ে গিয়ে ছা-শালিক মা-শালিকের পাশে বসল। আর তার মায়ের তখন কী আদর!

তাই দেখে ন্যাড়া আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল।

ন্যাড়া দুরন্ত ছিল খুবই। কিন্তু তার বুক ভরা দরদ ছিল। নইলে সে বড় হয়ে অমন দরদ দিয়ে গল্প-কাহিনী লিখতে পারে!

এই ন্যাড়াচন্দ্রই শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

একশ বছর পরেও—শরৎচন্দ্র—এই নামটি আমাদের মনে মণি-মুক্তোর মত জ্বলজ্বল করছে।

অনুশীলনী

১। 'এইসব নিয়েই ন্যাড়াচন্দ্রের চিড়িয়াখানা।'—ন্যাড়াচন্দ্রের চিড়িয়াখানা কি-সব নিয়ে তৈরি?

২। 'না, এমনি করে ওকে দুঃখ দেওয়ার মানেই হয় না।'—কেন একথা মনে হল? মনে হওয়ার পর সে কি করল?

একশ' বছর আগে

একশ' বছর আগের কথা।

দেবানন্দপুর—ছোট্ট একটি গ্রাম। হুগলি জেলায় ছায়ায়-ঢাকা পাখি-ডাকা এই গ্রামে শরৎচন্দ্রের জন্ম।

শরৎচন্দ্রের বাবা—মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। আর মা—ভুবন মোহিনী দেবী।

দেবানন্দপুর গ্রামটি ছিল মতিলালের মামার বাড়ি। তাঁর আদি নিবাস ছিল ২৪ পরগণা জেলায় মামুদপুর গ্রাম।

এই মামুদপুর গ্রামেই শরৎচন্দ্রের ঠাকুরদা—বৈকুণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় মশায় বাস করতেন।

বৈকুণ্ঠ চাটুজ্যে খুব নির্ভীক আর স্বাধীনচেতা মানুষ ছিলেন। অন্যায় তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না।

শোনা যায় অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিলেন বলেই গ্রামের জমিদার তাঁকে হত্যা করিয়েছিলেন।

এই সময় মতিলাল খুব ছোট ছিলেন। ছেলেকে নিয়ে নিরুপায় হয়ে মতিলালের মা তাঁর বাপের বাড়ি দেবানন্দপুর চলে আসেন।

মতিলাল বড় হয়ে আর মামুদপুরে ফিরে যান নি। মামাদের দেওয়া জমিতে ছোট একটি মাটির বাড়ি করে বসবাস শুরু করেন।

এই মাটির বাড়ির একটি ঘরের বাইরের দাওয়ায় মতিলাল একদিন অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন।

ঘরের ভিতরে ছিলেন মতিলালের মা এবং আরো কয়েকজন প্রতিবেশী মহিলা।

হঠাৎ শঙ্খ বেজে উঠল।

উপস্থিত মহিলাদের উলুধ্বনিতে ভরে উঠল জীর্ণ কুটির।

এমন, সময় মতিলালের মা মাটির ঘর থেকে দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন।

হাসিমাখা মুখে বললেন তিনি—ছেলে হয়েছে, ছেলে।*

এই ছেলেই শরৎচন্দ্র।

সেদিন ছিল শুক্রবার, ১২৮৩ সালের ৩১শে ভাদ্র।

ইংরেজি মতে ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ।

অনুশীলনী

১। শরৎচন্দ্রের জন্ম ও বংশ পরিচয় দাও।

২। তিনি কবে জন্মেছিলেন? কোথায় জন্মেছিলেন? তাঁর জন্ম-মুহূর্তটির বর্ণনা দাও।

---

*মতিলালের পাঁচ ছেলেমেয়ে। বড় অনিলা দেবী। তারপর পর-পর তিন ছেলে—শরৎচন্দ্র, প্রভাসচন্দ্র, প্রকাশচন্দ্র, সবার ছোট সুশীলা নামে মেয়ে।

প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালা

প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালা।

পাঠশালাটি বসে খড়ের ছাউনি দেওয়া চণ্ডীমণ্ডপে।

অনেকগুলি পড়ুয়া। তাদের নেতা শরৎচন্দ্র। ভীষণ দুরন্ত সে। কিন্তু দুরন্ত হলে কি হবে! সে আবার সবার সেরা ছাত্র। তার মেধাও খুব। তাই পণ্ডিতমশায় তাকে খুব স্নেহ করেন। তাছাড়া তাঁর ছেলে কাশীনাথ শরতের সহপাঠী। শুধু কি তাই! ওদের যেন হরিহর আত্মা। দুরন্তপনায় শরৎচন্দ্র সবার উপর টেক্কা দেয়।

একদিন হলো কী—

পণ্ডিতমশায় ধূমপানের জন্য কল্‌কের ভিতর তামাক আর টিকে সাজালেন। কিন্তু টিকে না ধরিয়ে কি যেন কাজে বাইরে বেরিয়ে গেলেন তিনি। আর অমনি শরতের মাথায় এক দুষ্টুমি-বুদ্ধি ঢুকল।

কল্‌কের ভিতর থেকে সব তামাক ফেলে দিল শরৎচন্দ্র। তারপর টুক্‌রো টুক্‌রো কতকগুলো ইট পুরে তার উপর টিকে সাজিয়ে রাখল।

পণ্ডিতমশায় বাইরে থেকে ফিরে দেশলাই জ্বালিয়ে টিকে ধরালেন। তারপর ফুঁ দিয়ে টিকে ধরিয়ে কল্‌কেয় টান দিতে লাগলেন তিনি।

কিন্তু একি! তামাকের ধোঁয়া বেরোচ্ছে না কেন?

ব্যাপারটা বোঝার জন্যে কলকে উল্টে দিলেন।

অবাক হয়ে দেখলেন—তামাকের বদলে কতকগুলো ইটের টুক্‌রো রয়েচে কল্‌কের ভেতর।

নিশ্চয়ই কোন পড়ুয়ার কাজ। পণ্ডিতমশায় রেগে আগুন। চীৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন—এ কাণ্ড কে করেছে রে?

পড়ুয়ারা ভয়ে সব চুপ।

আরো রেগে গিয়ে আবার তিনি হাঁক দিলেন—কে করেছে এই কাজ? বল্ বলছি। নইলে তোদের কাউকে আজ আর আস্ত রাখবো না।

পণ্ডিতমশায়ের এই মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে গেল বিনোদ। সেও একজন পড়ুয়া। ভয়ে ভয়ে বলে ফেলল—শরৎ করেছে।

আর যায় কোথায়! পাশ থেকে বেত নিয়ে শরৎকে মারতে উঠলেন পণ্ডিতমশায়।

শরৎ কিন্তু চোখের পলকে দে-ছুট। এক ছুটেই সে একেবারে পাঠশালার বাইরে পগার পার। পালিয়ে যাওয়ার আগে অবশ্য এক ধাক্কায় বিনোদকে ফেলে দিতে সে ভোলেনি।

পণ্ডিতমশায় তখন শরতের পিছু ছুটবেন, না বিনোদকে তুলবেন!

অনুশীলনী :

১। প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালায় পড়ুয়াদের নেতা কে ছিলেন? তিনি কি রকম পড়ুয়া ছিলেন? প্যারী পণ্ডিত তাঁকে স্নেহ করতেন কেন?
২। 'একদিন হলো কী'—কি হল? ঘটনাটি খুব অল্প কথায় লেখো।

কি সুন্দর অভিনয়

প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালা থেকে শরৎ পড়তে এল সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্যের বাঙলা ইস্কুলে। বছর তিনেক পড়তে না-পড়তেই তাকে চলে যেতে হল ভাগলপুর। ভাগলপুরে তখন তার দাদামশায় এবং মামারা বাস করতেন। সেখানে এসে শরৎ দুর্গাচরণ বালক বিদ্যালয়ে ভর্তি হল।

এখানেও সে পড়ুয়াদের পাণ্ডা। তাদের বলে—যারা সব বোকা তারাই হল বই-এর পোকা। আর যারা বুদ্ধিমান—যেমনি পড়ে, তেমনি খেলাও করে। দেহটাকে তাজা রাখতে হলে খেলাধূলা করা দরকার, বুঝলি?

ইস্কুল ছুটির পর বাড়ি গিয়ে খেয়েদেয়ে যে এক চিলতে সময় থাকে তাতে কি খেলার সময় পাওয়া যায়? সাথীরা বলে।

বেশি সময় পাবো কখন? সবাই শরৎকে শুধায়।

কখন আবার? মাথাটা একটু খাটালেই পাবি। সময়ের কি আর অভাব আছে?

তাও তারা ধরতে পারে না। আসলে কি বলতে চায় শরৎ! অবাক হয়ে সবাই শরতের দিকে তাকায়।

শরৎ তখন বলে, আরে বুঝলি না? ইস্কুলের ঘড়িটা একটু ফাস্ট করে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়।

সত্যি সত্যিই একদিন তারা একজন আরেক জনের পিঠে চেপে ঘড়িটা ফাস্ট করে দিল। ছেলেরা তখন মহাখুশি। চটপট বাড়ি গিয়ে মুখে কিছু গুঁজেই মাঠে দৌড়ায়।

কিন্তু মুশকিলে পড়লেন পণ্ডিতমশায়ের দল। ছুটির পর তাঁরা

বাড়ি ফিরে দেখেন তখনো চারটে বাজতে অনেক দেরি। আর এতো একদিন নয়, দিন-দিনই ঘটছে। কী ব্যাপার? অনুসন্ধান করতে হবে। ভার পড়ল অক্ষয় পণ্ডিতের উপর।

পণ্ডিতমশায় একদিন আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলেন। দেখেন—যোগীনের কাঁধে চেপে মোহন ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে দিচ্ছে!

তড়িতে তিনি গর্জে উঠলেন—কি হচ্ছে রে ওখানে? যত সব ছুঁচো পাজির দল। দাঁড়া তোদের দেখাচ্ছি মজা।

যোগীন আর মোহন বইপত্র নিয়ে নিমেষে উধাও।

পণ্ডিতমশায় পরক্ষণে বেত হাতে ক্লাসে ঢুকেই দেখেন—কেউ নেই ক্লাসে। শুধু শরৎ এক মনে বই পড়ছে।

গুরু-গম্ভীরস্বরে ওকেই জিজ্ঞেস করেন—ওরা সব কোথায়?

ভিজে বেড়ালের মত শরৎ উঠে দাঁড়িয়ে উত্তর দেয়—আমি তো জানি না স্যার।

না, কিছুই তুমি জানো না? ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে দিতো কে? রাগে কাঁপছেন পণ্ডিতমশায়।

নির্বিকার চিত্তে উত্তর করল শরৎ— আমি তো বসে বসে আঁক কষছিলাম। কিছুই দেখিনি।

পণ্ডিতমশায় ভাবলেন—হতেও পারে-বা শরৎ অপরাধ করেনি। এইসব ভাবতে ভাবতে চলে গেলেন তিনি ক্লাস থেকে।

কি সুন্দর অভিনয় শরতের!

অনুশীলনী

১। বালক শরৎ যে খুব সুন্দর অভিনয় করতে পারতেন, সে-সম্পর্কে একটি ঘটনার উল্লেখ করো।

চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় শরৎ পড়ছে। সাথে তার মামারা। বয়সে সবাই প্রায় কাছাকাছি।

শরতের দাদামশায়—কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—পাশেই খাটে শুয়ে রয়েছেন।

শুয়ে শুয়ে ওদের পড়া শুনছেন তিনি।

শুনতে শুনতে কেদারনাথের মনে হল—

ওরা যেন সবাই আগের দিনের পড়া পড়ছে।

জিজ্ঞেস করলেন তিনি—তোদের বুঝি আজ নতুন পড়া নেই?

একজন উত্তর দিল—না, নতুন-পড়া নেই।

—কেন?

—পণ্ডিতমশায় আসেন নি। জ্বর হয়েছে ওঁর।

শুনে কেদারনাথ অবাক হলেন একটু।

কি যেন কি ভেবে বাতি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

অসুস্থ পণ্ডিতমশায়কে দেখতে গেলেন তাঁর বাড়ি!

ছেলেদের আর আনন্দ ধরে না।

বড়দা বাড়িতে নেই। মেজদা অন্য কাজে ব্যস্ত।

এখন তো তারাই বাড়ির কর্তা। স্বর্গরাজ্য আর কাকে বলে!

মনের আনন্দে শরৎ প্রথম শুরু করল:

ক্যাট ইজ আউট

লেট মাইস প্লে···

সবাই তখন একই সুরে গাইতে লাগল ঃ

ডান্স লিট্‌ল বেবি, ডান্স আপ হাই—
নেভার মাইণ্ড বেবি, মাদার ইজ নাই।
ক্রো এণ্ড কেপার, কেপার এণ্ড ক্রো।
দেয়ার লিট্‌ল বেবি, দেয়ার ইউ গো।
আপটু দি সিলিং, ডাউন টু দি গ্রাউণ্ড
ব্যাকওয়ার্ডস এণ্ড ফরওয়ার্ডস
রাউণ্ড এণ্ড রাউণ্ড।
ডান্স লিট্‌ল বেবি, এণ্ড মাদার উইল সিং,
মেরিলি, মেরিলি ডিং ডং ডিং…।

ওরা সব থামতেই নাকিসুরে শরৎ বলল ঃ

খুশিসে খুশিসে—তাক্ ধিন্ ধিন্…।

অনুশীলনী

১। শরতের দাদামশায়ের নাম কি? 'ছেলেদের আনন্দ আর ধরে না?'—কেন?

২। 'স্বর্গরাজ্য আর কাকে বলে!'—'স্বর্গরাজ্য' বলতে কি বোঝানো হয়েছে? 'স্বর্গরাজ্য' পেয়ে শরৎ কি শুরু করলেন?

তারকেশ্বরে চুল দেওয়া[১]

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র ভাগলপুরের তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজিয়েট স্কুল থেকে এনট্রান্স পাস করে।

তখন সে তার মা-বাবার সঙ্গে ভাগলপুরে মামার বাড়িতে বসবাস করতো।

শরৎচন্দ্র এনট্রান্স পাস করলে তার মা একদিন ডেকে বললেন—তোকে একবার তারকেশ্বরে যেতে হবে যে বাবা।

মায়ের এই কথা শুনে শরৎচন্দ্র জিজ্ঞেস করলো—কেন মা?

মা বললেন—তারকেশ্বরে বাবার কাছে আমি তোর চুল মানত করে রেখেছি। দিয়ে আসবি।

সে-যুগে যুবকেরা অনেকেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করত না। তাই বন্ধুদের টিটকারীর ভয়েই শরৎচন্দ্র মায়ের কথার ঘোর আপত্তি তুলে বললে—সে সব হবে না মা। আমি কিছুতেই ন্যাড়ামাথা হতে পারবো না।

—কেন রে?

—বন্ধুরা আমার গায়ে থুতু দেবে।

—দিলে তুই সইবি। তাই বলে কি ঠাকুর দেবতার কাছে মানত করে আমি নরকে পচ্‌ব?

---

১ গোপালচন্দ্র রায়।

—না, আমি পারব না।

—বেশ তোকে যেতে হবে না। আমিই ব্যবস্থা করছি।

—কি করবে শুনি?

—কেন নাপতিনীকে ডেকে, আমার নিজের চুলই কেটে তারকেশ্বরে বাবা তারকনাথের কাছে পাঠিয়ে দেব।

শরৎচন্দ্র এবারে আর কোন কথা বললে না।

চুপ করেই মায়ের কাছ থেকে চলে গেল।

পরে শরৎচন্দ্র তারকেশ্বরে গিয়েছিল।

ফিরলো সে ন্যাড়া হয়ে।

অনুশীলনী

১। শরতের মা কি মানত করেছিলেন?

২। শরৎ তারকেশ্বরে যেতে চাননি কেন?

৩। শেষ পর্যন্ত মা কি ব্যবস্থা করলেন?

পাকা বাঁশের বন্দুক

শরৎ তখন বালক।

দেবানন্দপুর থেকে ভাগলপুরে এসেছে লেখাপড়া করতে। এসেই সে সমবয়সী ছেলেদের দলপতি হয়ে উঠেছে।

দলপতির দল রাখতে হলে তাদের নিত্য নতুন চমক দেখাতে হয়। নইলে দলের সবাই তাকে মানবে কেন! তাই সে একদিন ঘোষণা করল—এবার একটা বন্দুক তৈরি করবো।

তখনকার দিনে খেলনা বন্দুকও খুব বেশি দেখা যেতো না। তাই বন্দুক তৈরির কথা শুনেই সবার চমক লাগল।

একজন বলল—বন্দুক! বন্দুক তৈরি করবে তুমি?

—হ্যাঁ আমি। আমিই তৈরি করবো বাঁশের বন্দুক।

বাঁশের বন্দুক শুনে সবার আনন্দ যেন নিমেষে চুপসে গেল। তবু বলল একজন—বাঁশের বন্দুক! ওদিয়ে কাক মারা যাবে তো?

শরতের আঁতে ঘা লাগল।

ঠাট্টার কথা। আঘাত লাগবেই তো।

তাই সে জোর দিয়ে বলল—তোর বুদ্ধি-শুদ্ধি কিছুছু নেই দেখবি তখন কি মারবো। আগে তো তৈরি হোক। তারপর…

ছেলেটি ঠাট্টা করল—ও বুঝেছি বাঘ মারবে তাহলে।

শুনে এবার খুশিই হল শরৎ। গম্ভীর হয়ে বলল—বাঘ, ভালুক, হাতী, গণ্ডার, বুনো শূয়োর সবই মারা যাবে এই বন্দুক দিয়ে। বুঝলি? বাঁশ চাই, ভাল পাকা বাঁশ একটা।

মহা-আনন্দে বাঁশের খোঁজ করতে লাগল তারা। পেয়েও গেল যুৎসই একটা বাঁশ।

তারপর অসীম ধৈর্য আর চেষ্টার দ্বারা শরৎ বাঁশের একটি বন্দুক তৈরি করল।

বন্দুক তো তৈরি হল। কিন্তু কি মেরে পরীক্ষা করা যায়?

বাঘ ভালুক তো দূরের কথা। একটা বুনো শূয়োরও দেখতে পাওয়া গেল না।

সবাই মুষড়ে পড়ল। বন্দুক পরীক্ষা করবার জন্য শিকার পাওয়া যায় না একটা।

একদিন একজন বলল—একটা কুকুর মারলে হয় না? ওই তো একটা কুকুর দূরে শুয়ে আছে। ওটাই তো আমাকে সেদিন কামড়াতে গিয়েছিল।

সবাই তখন একবাক্যে বলে উঠল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কুকুরই মারা হোক কি বলিস?

শরৎচন্দ্র তখন গম্ভীর হয়ে বলল—না, কুকুর মারা হবে না। তোকে যদি কামড়ায়, তবুও না।

অনুশীলনী

১। কি দিয়ে কি ভাবে শরৎ বন্দুক তৈরি করেছিলেন?

২। বন্দুক দিয়ে তাঁর কি মারার ইচ্ছা ছিল? কুকুর মারার ব্যাপারে তাঁর আপত্তি ছিল কেন?

শরৎচন্দ্রের দাদামশাই তখন ভাগলপুরে থাকতেন। ভাগলপুরের বাড়িতে 'সংসার কোষ' নামে একটা বই ছিল। আর ওই বই-এর এক জায়গায় লেখা ছিল—বেলগাছের শিকড় সাপের ফণার উপর ধরলেই সাপ তৎক্ষণাৎ মাথা নীচু করে, একেবারেই সে হীনবল হয়ে পড়ে। সুড়সুড় করে সেখান থেকে চলে যায়।

ওই বইটি একদিন হাতে পেয়ে শরৎ চুপি চুপি বেলের শিকড়ের গুণাগুণ সব জানতে পারে। আর সেইদিন থেকেই তার মাথায় চাপে বেলগাছের শিকড় দিয়ে সাপ ধরতে হবে।

একদিন একটা শিকড় সে সংগ্রহ করল। সংগ্রহ করল মাটির হাঁড়ি আর সরা। সাপ ধরলেই পুরে রাখতে হবে তো। তারপর সারাদিন সে বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায় সাপের সন্ধানে। তার এই কাজের সাথী হল সমবয়সী মামা মণীন্দ্রনাথ। খুঁজতে খুঁজতে একদিন একটি গোখ্‌রো সাপের বাচ্চা দেখতে পেল তারা। আর তৎক্ষণাৎ শরৎ সাপের সামনে বেলগাছের শিকড় নিয়ে গেল।

কিন্তু একি! সাপ তো মাথা নিচু করে না। ফণা তুলে দুলতে থাকে। ছোবল দেয় আর কি! শরৎ তখন বিস্মিত; কিংকর্তব্যবিমূঢ়! ঠিক সেই মুহূর্তে মণিমামা পাশ থেকে লাঠির ঘা বসিয়ে দিল সাপের সেই উদ্ধত ফণায়। আর বাছাধন যায় কোথা! এক ঘায়েই একেবারে গঙ্গাপ্রাপ্তি। সাপের মৃত্যুতেও শরতের মুখ থেকে বেরিয়ে এল—আহা বেচারা।

অনুশীলনী

১। শিকড় দিয়ে সাপ ধরার পরিকল্পনার পরিণতি কি হয়েছিল?

"আমি তখন স্কুলে পড়ি।

রাজু[১] লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে লোকের সেবা করে বেড়ায়।

কে কোথায় কি বিপদে পড়েছে, তাকে উদ্ধার করা।

কার অসুখে লোক নেই, তার সেবা করা। কে কোথায় মরেছে, সেই মৃতদেহ দাহ করতে যাওয়া—এইসব হল তার কাজ।

আমি আবার ছিলুম রাজুর ডান হাত। দরকার হলেই রাজু আমাকে ডাকত। বিশেষ করে শবদাহের কাজ একা হত না বলে একাজে প্রায়ই যেতে হত রাজুর সঙ্গে।

ভাগলপুরে মামাদের বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পূজা হত খুব জাঁক করে। সেবার জগদ্ধাত্রী পূজার ঠিক পরের দিন, মামাদের বাড়িতে যাত্রা হচ্ছে। কলকাতা থেকে নামকরা দল এসেছে। পাড়ার এবং প্রতিবেশী অঞ্চলের সব ঝেটিয়ে এসেছে যাত্রা শুনতে। আমিও আসরে এক কোণে বসে তন্ময় হয়ে যাত্রা শুনছি। এমন সময় রাজু কোথা থেকে এসে কানে কানে বলল—উঠে আয়।

উঠে বাইরে এলাম।

রাজু বলল—ও পাড়ার তারাপদর ছেলেটা এইমাত্র কলেরায় মারা গেল। ছোট ছেলে, মাত্র বছর তিনেক বয়স।

---

* শরৎচন্দ্রের নিজের কথা

১ রাজু হল রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার। শরৎচন্দ্রের ভাগলপুরের সাথী।

অনেক চেষ্টা করলাম, কিছুতেই বাঁচানো গেল না। একমাত্র ছেলে। কলেরার মড়া, সেই তাকে নিয়েই তারাপদ আর তার স্ত্রী পাগলের মত কান্নাকাটি করছে। ঐ রোগের মড়া ঐভাবে ওদের কাছে ফেলে রাখাটা ঠিক নয়। তাই ভাবছি, এখুনি মড়া নিয়ে শ্মশানে যাব। এ পাড়ার সবাই তো যাত্রা শুনতে এসেছে, পাড়া খালি। তা তুই আয় আমার সঙ্গে।

আমি আর বাক্যব্যয় না করে সুড়সুড় করে রাজুর সঙ্গী হলাম। যাত্রা শোনার ঐখানেই ইতি।

তারাপদ আর তার স্ত্রীকে নানারকম প্রবোধ দিয়ে মৃত শিশুটিকে কোন প্রকারে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমরা যখন শ্মশানে রওনা হলাম, রাত্রি তখন বোধ করি একটা হবে।

অনুশীলনী

১. রাজু কে? সে কি প্রকৃতির ছেলে ছিল?

২. কি জন্য রাজু শরৎচন্দ্রকে ডাকতে এসেছিল? শরৎচন্দ্র তখন কি করছিলেন? শেষে কি হল?

গঙ্গানদীর একেবারে কিনারে কয়েকটি নিম ও দাঁররাঙ্গা গাছ কাছাকাছি দাঁড়িয়ে। ওদের ডালপালা আর পাতা সব মিলিয়ে মাঝের ফাঁকা জায়গাটুকু ছায়াছায়া করে রেখেছে। ওর ভেতরে কেউ যে ঢুকতে পারে এ ভাবাই যায় না।

অথচ এটাই ছিল শরৎচন্দ্রের ছেলেবেলার 'তপোবন'।

শরৎ এক-একদিন সঙ্গী-সাথীদের এড়িয়ে কোথায় যেন উধাও হয়ে যেতো। জিজ্ঞেস করলে বলতো—তপোবনে ছিলাম।

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের সাথী। আবার সম্পর্কে মামা। তার খুব ইচ্ছে শরতের তপোবন দেখে। কিন্তু সুযোগ আসে না অর্থাৎ কিনা শরৎ নিয়ে যায় না তার গোপন আশ্রয় তপোবন দেখাতে।

হঠাৎ একদিন সুরেন্দ্রনাথের তপোবন দেখার সুযোগ এসে গেল। তার মানে শরৎ রাজী হল তাকে তপোবনে নিয়ে যেতে। তবু শরৎ প্রথমে সুরেন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেছিল—তুই যদি আর কাউকে বলে দিস?

সুরেন্দ্রনাথ তখন পূর্ব দিকে মুখ ফিরিয়ে সূর্যদেবকে সাক্ষী রেখে বলল—কাউকে বলবো না, বলবো না, বলবো না।

এতেও কিন্তু দলপতি শরৎচন্দ্র সন্তুষ্ট হতে পারল না। বলল—তুই উত্তর দিকে মুখ ফিরিয়ে মা-গঙ্গা আর হিমালয় পর্বতকে সাক্ষী করে বল।

তাই করল সুরেন্দ্রনাথ।

তারপরই শরৎ তাকে নিয়ে তপোবনের দিকে চলল।

সবুজ পাতা দিয়ে ঘেরা, ছায়ায় ঢাকা তপোবন। পাতার ফাঁক দিয়ে সেখানে সূর্যরশ্মি ঢুকেছে। ফলে সেই তপোবন যেন আলো-আঁধারে আরো মনোরম হয়ে উঠেছে।

তপোবনের মাঝখানে রয়েছে প্রকাণ্ড একখানি পাথর। তার উপরে বসে পড়ে শরৎ সুরেন্দ্রকে ডাকে—আয় না। উঠে এসে বস।

সুরেন্দ্রনাথ শরতের পাশে বসে পাতার ফাঁক দিয়ে দেখে—গঙ্গা বয়ে চলেছে আপন বেগে। দূরে—ও-পারে আরো অপরূপ দৃশ্য। মন যেন চলে যায় কোন্ এক স্বর্গরাজ্যে।

শরৎচন্দ্র বলল—এইখানে বসে আমি বড় বড় ভাবনা ভাবি।

সুরেন্দ্রনাথ—তাই বুঝি তুমি অঙ্কতে একশ'র মধ্যে একশ' পাও।

লজ্জা পেল শরৎ। বলল—ধ্যুৎ।

হয়তো আর কোন কথা হয়নি দুজনে।

ফেরার পথে সুরেন্দ্রকে বলল শরৎ—এখানে কোনদিন একলা যেন আসিস না।

—কেন?

—ভয় আছে।

—কিসের ভয়! ভূতের?

গম্ভীর স্বরে শরৎ উত্তর দিল—না, ভূত-টুত কিছু নেই।

সুরেন্দ্র আরো কৌতূহলী হল। জিজ্ঞাসা করল—তাহলে কিসের ভয়?

নির্বিকার চিত্তে শরৎ জবাব দিল—এখানে সাপ থাকে।

সবে প্রবেশিকা পরীক্ষা শেষ হয়েছে।

দুই ভাই—সুরেন্দ্রনাথও গিরীন্দ্রনাথ, আর তাদের দুই বন্ধু—যোগেশচন্দ্র ও সতীশচন্দ্র—সবাই একদিন এক জায়গায় জুটেছে।

আলোচনা—কোথায় এখন বেড়াতে যাওয়া যায়।

এমন সময় সেই আসরে শরৎ এসে হাজির। ও তোরা সব বেড়াতে যাবি ঃ চল আমার সাথে। তোদের গুম্ফা দেখিয়ে আনি।

গুম্ফা[১] ভাগলপুর শহর থেকে মাইল চার-পাঁচ দূরে। একেবারে গঙ্গা নদীর তীরে।

সারাটা পথ শরৎ মজার মজার গল্প বলতে বলতে চলেছে। হাসি-গল্পের মধ্যে তারা বুঝতেই পারল না গুম্ফা কখন এসে গিয়েছে।

গুম্ফার ভিতরটা কী অন্ধকার! একটা মোমবাতি জ্বালানো হল। সবার আগে আলো-হাতে শরৎ। তার পিছু পিছু আর সবাই।

সঙ্গীদের সে বলল—সাবধানে নামবি। সিঁড়ি খুব খাড়া। একবার পড়লেই একেবারে দশ-বার ফুট নিচে।

শরতের হুঁশিয়ারীতে ওরা সবাই সতর্ক হল। ধীরে ধীরে নামতে লাগল। শেষে এক চিলতে চাতালে এসে পৌঁছুল।

সেখান থেকে আবার মাথা হেঁট করে সুড়ঙ্গ পথে নামা শুরু হল। নামতে নামতে এসে পৌঁছুল একটা চক্রাকার ঘরে।

মোমবাতির অল্প আলোয় দেখল—আরো অনেকগুলো সুড়ঙ্গ পথ

১। মাটির নীচে গুহা

ওই ঘরে এসে মিশেছে। কোন পথে গুম্ফার শেষ প্রান্তে পৌঁছানো যাবে? এ যে একেবারে গোলক ধাঁধা! অনেকগুলো পথের একটা বেছে নিয়ে শরৎ এগিয়ে চলল। পিছু পিছু ওরা।

আবার অকটা গোলক ধাঁধার মত গোলঘর সুড়ঙ্গ পথে এমনি অনেক পথ। ক্রমে সুড়ঙ্গ সরু হতে লাগল। হেঁট হয়ে আর হাঁটা যায় না। শেষে হামাগুড়ি দিয়ে চলা। তবু কি শেষ আছে! এবারে তো বুকে চলা ছাড়া উপায় নেই। তাছাড়া শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে বেশ। ওরা আর এগুতে চায় না।

আরে, শরৎ কোথায়! অবাক হল ওরা।

হঠাৎ শুনল—চলে আয়, কোন ভয় নেই। দূর থেকে আসা শরৎচন্দ্রের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর।

না, আমরা আর যাবো না। তুমি এখুনি চলে এসো। আমাদের ভয় করছে। চীৎকার করে বলল ওরা।

—ওখানেই দাঁড়া। যাচ্ছি।

একটু বাদে গা-ময় কাদা মেখে শরৎ ফিরে এল।

ওকে দেখে ওরা বুঝল সুড়ঙ্গ-পথ গঙ্গায় গিয়ে মিশেছে।

গুম্ফার ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে আসতে শরৎ বলল: খুনী আসামীরা এই গুহায় এসে লুকিয়ে থাকে। কেউ গুহা দেখতে এলে তার আর রক্ষা নেই। একেবারে···

তাছাড়া সাপ তো আছেই। একবার একটা বাঘ এসে এই গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল। শুনতে শুনতে সঙ্গীদের গা কাঁটা দিয়ে উঠল।

ভয়ে ভয়ে বলল—তাহলে এলে কেন?

রাখে হরি মারে কে। বুঝলি না। হাসিমুখে বললে শরৎ।

আগুন থেকে রক্ষা

শরৎচন্দ্র তখন রেঙ্গুনে চাকুরি করতেন। বাস করতেন ভাড়া করা একটা কাঠের বাড়িতে। ওখানের বাড়িগুলো সবই প্রায় কাঠের তৈরী।

দোতলায় উনি থাকতেন। আর নিচের তলায় এক ধোপা বাস করত। সেই ধোপার গাধা তো ছিলই, একটা ছাগলও ছিল।

একদিন গভীর রাতে কিভাবে যেন ধোপার ঘরে আগুন লেগে যায়। শরৎচন্দ্র তখন অঘোরে ঘুমিয়ে। নিচের ভাড়াটের চীৎকারে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে বুঝতে পারেন নিচের ঘরে আগুন লেগেছে। দেখেন আগুনের শিখা উপরের দিকে এগিয়ে আসছে হুহু করে।

এই না দেখে তৎক্ষণাৎ তিনি কিছু দামী দামী বই একটা ট্রাঙ্কে পুরে নিচে ফেলে দিলেন। তারপর নিজে নামতে গিয়ে দেখেন—কাঠের সিঁড়িটাই জ্বলছে। অযথা আর দেরী না করে শরৎচন্দ্র ওই জ্বলন্ত সিঁড়ির অদগ্ধ অংশ ধরেই ঝুলে পড়লেন নিচে।

নিচে নেমেই খোঁজ করলেন ধোপার ঘর থেকে সবাই বেরিয়েছে কিনা। দেখেন সবাই বেরিয়েছে। গাধাটিও।

কিন্তু ছাগলটি।

ওই তো ওটা চীৎকার করছে ঘরের ভিতর থেকে

শরৎচন্দ্র পলকে সেই জ্বলন্ত ঘরে কে পড়লেন।

কেউ বাধা দেবার অবকাশই পেল না। সবার মনে তখন দারুণ উৎকণ্ঠা। শেষে কি একটা ছাগলের জন্যে তাদের দাদাঠাকুর আগুনে নিজেকে আহুতি দেবেন!

কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি অসহায় ছাগ-শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে জ্বলন্ত শিখার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন।

তাঁর গোটা দেহের জায়গায় দহনের চিহ্ন। তবু তাঁর মুখে প্রসন্ন হাসি।

তিনি এক অবলা জীবকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছেন। একি তাঁর কম আনন্দ!

অনুশীলনী

১. রেঙ্গুনে বাড়িগুলি কিসের তৈরি? শরৎচন্দ্র সেখানে কিরকম বাড়িতে থাকতেন?

২. শরৎচন্দ্র কি ভাবে জ্বলন্ত কাঠের বাড়ি থেকে ছাগ-শিশুটিকে রক্ষা করেছিলেন? এর থেকে তাঁর চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে?

রেঙ্গুনে বার্মা অয়েল কোম্পানির কারখানার চাকরি গেল। আমি[১] পড়ে গেলাম বিপদে। আমার দু-চারজন বন্ধু তখন বার্মায় গোল্ড মাইনে চাকরি করছিল। ক্রমান্বয়ে চিঠিপত্রের চালাচালিতে, হঠাৎ এক বন্ধুর চিঠি পাওয়া গেল, 'নামটু গোল্ড মাইন'-এ গেলে চাকরি হতে পারে।

দু-চারদিন পরে শরৎবাবু খবর পেলেন। তিনি বললেন—তুমি নামটুতে চলে যাও, এখানে তোমার কোন সুবিধা হবে না।

তখন আমি কপর্দকহীন। এমন কি বেণীবাবু বলে এক ভদ্রলোক আমার কাছে একশ' টাকা পেতেন।

আবার দু-চারদিন পরে শরৎবাবু বললেন—কি হে সুরেন, তোমার নামটু যাওয়া কী হল ?

আমি আর গোপন করতে না পেরে বললাম—দাদাঠাকুর, যাই কি করে ? একটা পয়সা নেই ; দাদাঠাকুরের হোটেলে খোরাকির টাকা বাকি ; আবার বেণীবাবু পাবেন একশ' টাকা।

শরৎবাবু আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে আর কোন কথা বললেন না। পরদিবস ডেকে বললেন—সুরেন, এদিকে এসো।

আমি তখন সামনে যেতে বললেন—রেঙ্গুন হতে নামটু যাবার রাস্তা জান ?

১। সুরেন্দ্রনাথ মান্না

প্রথমে ম্যাণ্ডেলের মেল গাড়ীতে উঠে তোমাকে ম্যাণ্ডেলে নামতে হবে। উঠতে হবে লাসিওর গাড়ীতে। লাসিও যেতে পথে পাবে নামিও ষ্টেশন। সেই ষ্টেশনে নেমে রাত্রে ষ্টেশনে থাকতে হবে। পরদিন সকালবেলা পাবে মাইন-এর গাড়ী। যদিও প্যাসেঞ্জার নিয়ে যাতায়াত করে না বটে, তবুও তোমার বন্ধুর চিঠি দেখালেই তোমাকে নিয়ে যাবে। খরচ পড়বে গাড়ীভাড়া সহ প্রায় পনের টাকার মতন। টাকাটা আমি দিচ্ছি, তুমি আর দেরী না করে দু-একদিনের মধ্যেই বেড়িয়ে পড়।

আমি বেণীবাবুর টাকাটার কথা বলতেই তিনি বললেন—সে টাকার বিষয় তোমাকে ভাবতে হবে না। তার জবাব আমি দেবো। যাচ্ছ শীতের দিনে, সেখানে শীত খুব বেশী। জামা কাপড় দরকার হলে আমাকে চিঠি দিও। দেখি কাল কটায় ট্রেন ছাড়ে।

পরদিবস সকালবেলায় শরৎবাবু বই দেখে আমায় বলে দিলেন। এমনকি যাবার খরচের টাকাটাও আমার হাতে দিলেন।

আমি আর কোন কথা না বলে সেদিনই দুটোর গাড়ীতে নামটু চলে গেলাম। আজও সেই মহাত্মার কৃপায় স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখে কালযাপন করছি।

শরৎবাবুকে আমরা শুধু বন্ধুভাবে দেখিনি। আমরা যেমন দেখেছি, একদিকে বন্ধু অপরদিকে আত্মীয়। তিনি একদিকে ছিলেন পরোপ-কারী, অপরদিকে ছিলেন দেবতা।

অনুশীলনী

১, 'তিনি···ছিলেন দেবতা।'—কে, কেন একথা বলেছেন বুঝিয়ে বলো।

বাটু একটি পাখি

রেঙ্গুনে থাকার সময় শরৎচন্দ্র একটি নুরি কিনেছিলেন। মালয় উপদ্বীপের এক জাতীয় টিয়াপাখিকে 'নুরি' বলে।

শরৎচন্দ্র এই পাখিটির নাম রেখেছিলেন—বাটু। আদর করে ডাকতেন—বাটু বাবা।

বাটুর গায়ের পালকগুলি ছিল লাল টুকটুকে। আর ডানার পালক সব সবুজ রঙ-এর। ভারি সুন্দর দেখতে সে। দেখলেই ইচ্ছে মতো গায়ে হাত দিয়ে আদর করতে।

শরৎচন্দ্র বাটুকে খুব ভালবাসতেন। তার প্রতি তাঁর সব সময়েই সজাগ নজর ছিল। আঙ্গুর, কিস্‌মিস্, পেস্তা, বাদাম, আনারস কুচি প্রভৃতি ফল বাটিতে বাটিতে সাজিয়ে রাখতেন তিনি। যখন যা ইচ্ছে বাটু খাবে।

একদিন সন্ধ্যার পর সতীশচন্দ্র দাস শরৎচন্দ্রের বাড়িতে এসেছেন। দুজনে বন্ধুত্ব ছিল খুব। এসে দেখেন, শরৎচন্দ্র বাটুকে খাওয়াচ্ছেন। একটু অবাক হলেন তিনি।

রাত্রে আবার পাখি খায় নাকি। মনে মনে ভাবলেন। প্রকাশ্যে শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেন—রাতে কি পাখিকে খেতে দিতে হয়?

শরৎচন্দ্র উত্তর করলেন—জঙ্গলে থাকলে ওরা ইচ্ছেমত খাবার সংগ্রহ করে। কিন্তু যখন লোকালয়ে আছে, তখন আমাদের মত করে নিতে হয় বৈকি। আমরা তো রাতে খাই।

একটু থেকে আবার তিনি বললেন—ভালবেসে যখন পাখিকে জঙ্গল থেকে আনা হয়েছে, তখন সেই ভালোবাসাটা তাকে বুঝতে দিতে হবে। বনের পাখি নিজের করে নিতে না পারলে, তাকে আটকে রাখা কেন?

শরৎচন্দ্র পাকাপাকিভাবে রেঙ্গুন ছেড়ে চলে এলে বাটুও তাঁর সাথে আসে। প্রায় দশ বছর বাটু বেঁচে ছিল। দশ বছরেই শরৎচন্দ্র তাকে আপন সন্তানের মত আদর-যত্ন করতেন।

বাটুর মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্র একটা খাতার মলাটের উপর লিখেছিলেন ঃ

আজ রাত্রি ১০-৪৫
বাটুর মৃত্যু হোলো
মঙ্গলবার ২৪শে ফাল্গুন, ১৩৩৮
সামতেবেড়ে, হাওড়া।

বন্ধন থেকে সে নিজেই শুধু মুক্তি পেলে না, আমাকেও একটা মস্ত মুক্তি দিয়ে গেল।

অনুশীলনী

১. 'হুরি' কি? তাকে দেখতে কেমন? তাকে শরৎচন্দ্র কি কি খাওয়াতেন?

২. বাটুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের কিরকম সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল?

ভেলু আর নেই[১]

শরৎচন্দ্রের একটা কুকুর ছিল—তিনি বিলাতী নহেন, খাঁটি দেশী। তার নাম ছিল ভেলু।

কুকুরটি দেখতে ছিল কদাকার, আর তার আচরণ ছিল অতি অভদ্র। যে কেউ শরৎচন্দ্রের শিবপুরের বাসায় গিয়েছেন, তিনিই জানেন যে, অভ্যাগতকে কি বিপুল গর্জনে ভেলু অভ্যর্থনা করত। দর্শন-প্রার্থীরা ভেলুর এই সম্ভাষণে আত্মরক্ষার্থে দশ হাত পিছিয়ে পড়তেন।

ভেলুর গর্জন শুনে শরৎচন্দ্র ঘরের মধ্য থেকে যেই বলতেন—'এই ভেলু'। আর অমনি মেষ-শাবকের মত দৌড়ে গিয়ে প্রভুর কোলে চড়ে বসত। শরৎচন্দ্র তাঁর এই ভেলুকে যে কি ভালবাসতেন, তা আর বলতে পারিনে।

সেই ভেলু একবার অসুস্থ হয়ে পড়ল। বাড়ীতে যত রকমের চিকিৎসা করা যেতে পারে, শরৎচন্দ্র তা করলেন। দু'হাতে অর্থ ব্যয় করতে লাগলেন। শেষে অনন্যোপায় হয়ে ভেলুকে বেলগাছিয়া পশু চিকিৎসালয়ে নিয়ে গেলেন—পাঠিয়ে দিলেন না।

ভেলু যে-কদিন সেখানে বেঁচে ছিল, শরৎচন্দ্র প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠে সেই চিকিৎসালয়ে গিয়ে ভেলুর পিঞ্জর প্রান্তে বসতেন। সারাদিন স্নান আহার ত্যাগ করে ভেলুর দিকে সতৃষ্ণ

১ খ্যাতনামা সাহিত্যিক জলধর সেন

নয়নে চেয়ে থাকতেন। রাত্রিতে যদি সেখানে থাকতে দেয়ার আদেশ থাকত, তাহলে শরৎচন্দ্র অনাহারে অনিদ্রায় তাঁর ভেলুর পিঞ্জরপার্শ্বেই বসে থাকতেন। কিছুতেই তিনি ভেলুকে বাঁচাতে পারলেন না। তার মৃতদেহ শিবপুর নিয়ে গিয়ে সমাধিস্থ করলেন।

আমি সংবাদ পেয়ে সেই দিনই শিবপুর গেলাম। আমাকে দেখে দৌড়ে এসে শরৎচন্দ্র আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন—

'দাদা, আমার ভেলু আর নেই!'

তাঁর মুখ দিয়ে আর কথা বের হল না।

অনুশীলনী

১. ভেলু কে? ভেলু কি ভাবে অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা করত?

২. ভেলু অসুস্থ হলে শরৎচন্দ্র কি করেছিলেন? সে মারা গেলে শরৎচন্দ্রের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?

ভেলুর পরে বাঘা

ভেলু প্রায় তের বছর বেঁচে ছিল। ভেলু মারা যাবার পরে শরৎচন্দ্র সামতাবেড়েয় গিয়ে আরেকটি কুকুর পুষেছিলেন। ওর নাম রেখেছিলেন—বাঘা।

বাঘা দেশী কুকুর। ওর গায়ের রঙ লাল। ভেলুর মত অতটা আদর না পেলেও বাঘারও আদর-যত্নের কিছু কমতি ছিল না। বাঘা যেন ছিল শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ির পাহারাদার।

সব-সময়েই বাঘা ছাড়া থাকত। ফলে গোটা গ্রাম ঘুরে বেড়াতে তার বাধা ছিল না। আর সে তো গ্রামেরই কুকুর।

একদিন হল কি ঘুরতে ঘুরতে সামতা ছাড়িয়ে সে ম্যাল্লাক গ্রামে গিয়েছিল। সেই গ্রামের জমিদার মোহিনী ঘোষালের বাড়ীর সামনে একটা পাগলা শেয়াল বাঘাকে তাড়া করে। বাঘাও কম যায় না। সেও রুখে দাঁড়ায়। আর অমনি শেয়ালটা বাঘাকে কামড়ে দেয়। বাঘাও তাকে কামড়াতে ছাড়ে না।

শরৎচন্দ্র সব খবর জানতে পেরে বাঘার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু পাগলা শেয়ালের কামড় থেকে বাঘাকে বাঁচাতে পারেন নি।

বাঘার জন্য তাঁর মর্মবেদনা খাতার মলাটে লিখে রাখলেন :

আজ বাঘা মারা গেল।
মোহিনী ঘোষালের বাড়ির সম্মুখে
কি জানি কবে—
তাকে পাগলা শিয়ালে কামড়ে ছিল।

আর একটা ভাবনা

হাওড়ায় ভাড়া করা বাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন শরৎচন্দ্র। রূপনারায়ণ নদের তীরে সামতাবেড়েয় বাড়ি করেছেন তিনি। সেখানেই তখন বসবাস করেন।

একদিন তিনি বেড়াতে বেরিয়েছেন। একা একাই পথ চলছেন। এমন সময় দেখেন—পথের পাশে এক জায়গায় গুটি কয়েক লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। একজনের হাতে ধরা একটা খাসি। খাসিটি প্রাণভয়ে ব্যা ব্যা করছে।

ব্যাপারটা কি শরৎচন্দ্র জানতে চাইলেন ওদের কাছে।

ওদের একজন বলল—খাসিটা কেনা হয়েছে। কেটে মাংস ভাগ করে নেবো।

মুহূর্তে শরৎচন্দ্রের মন চঞ্চল হল। মায়া হল তাঁর ওই খাসিটার উপর। তাই তিনি ওদের বললেন—তোমরা এক কাজ কর না, যে দামে খাসিটা কিনেছো, আমি দিচ্ছি; আমাকে ওটা দাও কেন, কেটো না ওটাকে!

ওরা শরৎচন্দ্রকে ভালভাবেই আগে থেকে চিনতো এবং মান্যও করতো খুব। তাই কেউ কোন কথা বলল না। খাসিটা শরৎচন্দ্রের বাড়িতে পৌঁছে দিল। শরৎচন্দ্র দাম দিয়ে দিলেন। তারা খুশি মনে চলে গেল সবাই।

শরৎচন্দ্র খাসিটির নাম রাখলেন—স্বামীজী। তার খাওয়ার

দিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি। ফলে ছুদিনেই ছাগলটি বেশ মোটাসোটা হয়ে উঠল।

দিনেরবেলায় ছাড়া থাকত সে। তাই বলে পরের কোন গাছ-পালায় কোনদিন মুখ দিতো না।

আশপাশে সে যেখানেই থাকুক, 'স্বামীজী' এই নামে শরৎচন্দ্র একবার ডাকলেই ছুটে আসতো। তার গায়ের রঙ ছিল গেরুয়া, তাই মনে হতো—যেন একটা হরিণ।

স্বামীজী একদিন মারা গেল।

শরৎচন্দ্র আবার সেই খাতার মলাটে লিখলেন :

১৩ই মাঘ, ১৩৩৯, বেলা ১১-৩
বৃহস্পতিবার স্বামীজীর মৃত্যু,
আর একটা ভাবনা ঘুচলো।
সামতাবেড়ে, হাওড়া।

অনুশীলনী

১. স্বামিজী কে? শরৎচন্দ্র তাকে কিভাবে জোগাড় করেছিলেন।
২. স্বামিজী দেখতে কেমন ছিল? সে মারা গেলে শরৎচন্দ্র খাতার মলাটে কি লিখে রাখলেন?

ব্রহ্মদেশ থেকে ফিরে এসে তিনি শুধু লেখা নিয়েই থাকেন। ইতিমধ্যে তাঁর অনেকগুলো বই বাজারে বেরিয়ে গিয়েছে। খুব তখন তাঁর নাম-ডাক। বইয়ের আয় থেকেই সংসার চলে। কোন চাকুরি করেন না তিনি।

এমনি সময় একদিন বীরভূম জেলার হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মশায় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। সকাল তখন সাতটা।

বসবার ঘরে ঢুকে হরেকৃষ্ণ দেখলেন—

ঘরের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় একটা মাঝারি ধরনের টেবিল। টেবিলের তিন পাশে তিনটি চেয়ার, বাকি পাশে একটি বেঞ্চি। টেবিলের উপর বাঁধানো খান দুই খাতা। একটি দোয়াতদানে দুটি দোয়াত—লাল কালির ও কাল কালির। গোটা চারেক কলম, দুটি ঝর্ণা পেন, কয়েকখানি বই। সবই সুন্দরভাবে টেবিলের উপর সাজানো।

শরৎচন্দ্র একটি চেয়ারে বসে রয়েছেন। পাশে প্রকাণ্ড একটি গড়গড়া। চাকর এসে তামাক দিয়ে গেল। তিনি গড়গড়ার নল টানতে টানতে হরেকৃষ্ণ মহাশয়ের সাথে গল্প করতে লাগলেন।

এমন সময় ভিতর থেকে কে যেন ডাকলেন তাঁকে।

তিনি উঠে গেলেন।

কিছু বলে না যাওয়ায় হরেকৃষ্ণ মনে মনে অপ্রস্তুত হলেন। দেখতে

দেখতে আধঘণ্টা কেটে গেল। তবু শরৎচন্দ্র বাইরে আসেন না। থাকবেন, না চলে যাবেন—হরেকৃষ্ণ মশায় ভাবছেন বসে বসে।

ঠিক এই সময় শরৎচন্দ্র ফিরে এলেন।

কিন্তু একি ?

শরৎচন্দ্রের চোখ থেকে জল পড়ছে ঝরঝর করে। কান্না চাপতে চেষ্টা করছেন তিনি। তবু পারছেন না।

হতবাক হরেকৃষ্ণ। ভিতরে নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে। হয়তো তাঁর খেয়াল ছিল না যে বাইরে বসে রয়েছেন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। না পারেন তিনি উঠে যেতে, না পারেন কিছু জিজ্ঞেস করতে।

শেষে শরৎচন্দ্রই মুখ খুললেন। বললেন—

পাখিটা মরে গেল। কোন রকমে বাঁচানো গেল না। অসুখটা তিনদিন মাত্র আগে জানতে পেরেছি। কত চেষ্টাই তো করলাম।

আজ তিন বছর পাখিটা সঙ্গে সঙ্গে ছিল। এক দণ্ডের জন্য কাছ ছাড়া করিনি। অসুখ যে এতটা গুরুতর আগে জানতে পারিনি। হঠাৎ বেড়ে উঠায় বাড়ির ভিতর থেকে খবর পেয়ে উঠে গেছলাম। কিছু মনে করবেন না।

এমনি ছিল তাঁর হৃদয় !

অনুশীলনী

১। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কে ? তিনি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে এসে কি অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন ?

পাখি পোষার শখ

কাকাতুয়া পাখির আর্ত চীৎকার।

পথ চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন শরৎচন্দ্র। তাঁর সাথে ছিলেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। তিনিও লেখক। তাঁর ও নাম হয়েছে।

তাঁকে উদ্দেশ্য করেই শরৎচন্দ্র যেন গর্জে উঠলেন—শুনছো নৃপেন। বড়লোক! পাখি পোষার শখ!

হন্‌হন্‌ করে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়লেন শরৎচন্দ্র। বাড়ির হিন্দুস্থানী দারোয়ান রুখে দাঁড়ালো। রুক্ষকণ্ঠে বলল—

আরে বাবু ক্যায়া ম্যাংতা!

শরৎচন্দ্র ব্যঙ্গ করলেন তাকে—ক্যায়া মাংতা!

সামনে তিনি দেখলেন—বাড়ির কাকাতুয়াটি কিভাবে নিজের গলায় দড়ি জড়িয়ে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে।

দারোয়ানের বাধা ভ্রূক্ষেপ করলেন না তিনি। উঠোনের দিকে কাকাতুয়ার কাছে এগিয়ে গেলেন, তাকে ফাঁসমুক্ত করলেন।

দারোয়ান ততক্ষণে ভেবে নিয়েছে, লোকটি পাখি চুরি করতে এসেছে। তাই সে শরৎচন্দ্রকে পাকড়াও করবার জন্য হাত পাকিয়ে এগিয়ে গেল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে বাড়ির ভিতর থেকে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। বিস্মিত হলেন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন—

আপনারা ? কী ব্যাপার ? কাকে চান ?

এইসব প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে শরৎচন্দ্র পাল্টা প্রশ্ন করলেন—এ পাখি বুঝি আপনার ? পাখি পোষার খুব শখ আপনার, না ?

ভদ্রলোক আরো অবাক হলেন। ভাবলেন, অপরিচিত লোক এসব বলে কী ! একটু রেগে তিনি বললেন—আপনি কী বলছেন ?

তবু শরৎচন্দ্র থামলেন না। ভর্ৎসনার সুরে বললেন—জীবজন্তু পুষতে হলে অন্তরে মমতা থাকা চাই। বুঝলেন ? কতক্ষণ ধরে পাখিটা যন্ত্রণায় চীৎকার করছে, সেদিকে কারুর হুঁশ নেই।

ভদ্রলোক এতক্ষণে ধরে নিয়েছে লোকটি পাগল।

ইতিমধ্যে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রলোককে বললেন—ওঁকে বোধহয় চেনেন না। উনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ভদ্রলোক তখন বলে উঠলেন—যিনি ঔপন্যাসিক ?

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ—হ্যাঁ।

মুহূর্তে ভদ্রলোক হাত্‌জোড় করে শরৎচন্দ্রের কাছে ক্ষমা চাইলেন। মিনতি করে বললেন—

এভাবে যখন এসে পড়েছেন, তখন গরীবের বাড়িতে—

নিমেষে শরৎচন্দ্রের গলার সুর বদলে গেল। একান্ত পরিচিতের মত বললেন—

না হে, না, বিশেষ দরকারে বেরিয়েছি—হয়তো দেরি হয়ে গেল—চলো হে নৃপেন—চলো।

বলতে বলতে শরৎচন্দ্র বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন।

অনুশীলনী

১. জীবজন্তু পুষতে হলে অন্তরে মমতা থাকা চাই।'—একথা কে, কখন, কাকে এবং কেন বলেছিলেন ?

শরৎচন্দ্র তখন হাওড়া জেলার বাজে-শিবপুরে বাস করেন। একদিন শীতের সকালে কি একটা কাজে বাইরে বেরিয়েছেন। পথ চলতে হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল পথের একধারে চারটে কুকুরছানা পড়ে পড়ে কুঁই-কুঁই করছে। আর তিনটে কৌতূহলী ছেলে ওদের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তিনি দেখলেন কিছুক্ষণ। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন কুকুর-ছানাগুলোর কাছে।

কিরে এদের মা কই ? শুধালেন ছেলে তিনটিকে।

একজন জবাব দিল—এদের মাকে তো দেখছি না। এরাই তো পড়ে রয়েছে।

—এদের মাকে তোরা চিনিস ?

—হ্যাঁ চিনি। কাল রঙের কুকুর।

—তোরা তাহলে পাড়ার ভিতরে গিয়ে খুঁজে দেখ দেখি পাস কিনা। আমি ততক্ষণ এখানেই দাঁড়িয়ে থাকি।

ওরা চলে গেল। শরৎচন্দ্র একাই দাঁড়িয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পর ছেলেরা ফিরে এসে বলল—খুব খুঁজলাম আমরা। কোথাও পেলাম না।

মহাভাবনায় পড়লেন শরৎচন্দ্র। ভাবতে ভাবতে বললেন—তাই তো রে, এদের মা না এলে এরা বাঁচবে কি করে !

তারপর দুটো বাচ্চা দুহাতে তুলে নিয়ে বললেন ছেলেদের—ও দুটো তোরা নে তো। আয় আমার সাথে। খুব সাবধানে নিবি, লাগে না যেন।

বাড়িতে নিয়ে এসেই ভৃত্য ভোলাকে বললেন—ওরে চটের থলে নিয়ে আয় দেখি। আর ঘরে যা দুধ আছে নিয়ে আয়।

চটের থলের উপর রেখে একে একে ওদের দুধ খাওয়াতে লাগলেন শরৎচন্দ্র।

শুধু সেদিন কেন দু-দিন ধরেই মা-কুকুরকে খোঁজা হল তন্ন তন্ন করে। না, কোথাও তাকে পাওয়া গেল না।

তবু শরৎচন্দ্র হাল ছাড়লেন না। নিজেই খুঁজতে বের হলেন। তিন দিনের দিন খুঁজতে খুঁজতে পাওয়া গেল মা-কুকুরকে। পোড়ো বাড়ির মজা একটা পাতকুয়োর ভিতরে পড়ে গিয়েছিল কুকুরটি। মরে নি। মরণাপন্ন হয়ে পড়েছিল।

অনেক কষ্টে শরৎচন্দ্র কুয়োর ভিতর থেকে তুললেন তাকে। পাঁউরুটি খাওয়ালেন, সন্দেশ খাওয়ালেন। তারপর তাকে তার সন্তানদের কাছে নিয়ে গেলেন।

তখন তার কি আনন্দ! বাচ্চাগুলোও মাকে পেয়ে মহানন্দে কুঁই কুঁই করতে লাগল।

আর শরৎচন্দ্র? অসীম বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন তাদের দিকে। তাঁর চোখ দুটি জলে ভরে উঠল।

এ তো জল নয়, আনন্দ-অশ্রু।

অনুশীলনী

১. 'এ তো জল নয়, আনন্দ-অশ্রু'।
—কিভাবে চোখের জল আনন্দ-অশ্রুতে পরিণত হয়েছিল?

দহি-চূড়ার ভোজ

মাঝে মাঝে শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে বেড়াতে যেতেন। দেবানন্দপুরে জন্ম হলে কি হবে, তাঁর বাল্য, কৈশোর ও তরুণ বয়সের অনেকটাই কেটেছে ভাগলপুরে।

সেবারে তিনি নদীপথে ভাগলপুর থেকে কলকাতায় ফিরছেন। তখন পাটনা-কলকাতা স্টিমার সার্ভিস ছিল। স্টিমার পাটনা ছেড়ে ভাগলপুর, গোয়ালন্দ প্রভৃতি হয়ে সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে এসে কলকাতা পৌঁছুতো।

সেবার ভাগলপুর থেকে আসার সময় শরৎচন্দ্রের সহযাত্রী ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথ। তাঁরা দুজনেই সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মামা ছিলেন।

দুপুরে রওনা হলেন তারা ভাগলপুর থেকে। বিকেলের দিকে তাঁদের স্টিমার কাহালগাঁয়ে পৌঁছুলো।

কাহালগাঁ বড় একটা স্টিমার-ষ্টেশন। স্টিমার বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়ায় সেখানে। একথা শরৎচন্দ্র জানতেন। তাই তিনি একাই নেমে গেলেন স্টিমার থেকে।

এদিকে স্টিমার ছাড়ার সময় হয়ে এল। তবু শরৎচন্দ্র ফিরে আসেন না। ব্যাপার কী? কিছু ঘটলো নাকি!

এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সুরেন্দ্র এবং গিরীন্দ্র উভয়েই নেমে গেলেন শরৎচন্দ্রকে খুঁজতে।

তাঁরা নেমে গিয়ে দেখেন—

স্টিমার ঘাটে এক খাবারের দোকানে শরৎচন্দ্র বসে রয়েছেন। আর তাঁর সামনে পনের-কুড়িটি কুকুর 'দহি-চূড়া'র ভোজে রত! বছর বারো-তের বয়সের একটি ছেলে শরৎচন্দ্রের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুকুরগুলোকে দই-চিড়ে পরিবেশন করছে।

সুরেন্দ্রনাথ আর গিরীন্দ্রনাথ তো অবাক।

শরৎচন্দ্র দোকানীকে দই-চিড়ার দাম মিটিয়ে ওদের সাথে স্টিমারে উঠলেন।

অনুশীলনী

১. স্টিমার ঘাটে খাবারের দোকানে বসে শরৎচন্দ্র কি করছিলেন? সুরেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথ কি ভাবে তাঁকে খুঁজে বের করলেন?

আমি তাঁকে বন্দনা করি[১]

সেদিন রবিবার।

আমি প্রায় প্রতি রবিবারেই শরতের বাসায় যেতাম। সারাদিন সেখানে কাটিয়ে রাত আটটা-নটায় কলকাতায় ফিরে আসতাম।

সেদিন প্রাতঃকালে গিয়ে দেখি, ঘরের মধ্যে একরাশি ছোট-বড় কলের ধুতি-শাড়ি ছড়ানো রয়েছে। শরৎচন্দ্রের ভৃত্য সেগুলি গুছিয়ে বাঁধবার আয়োজন করছে। শরৎ একখানি চেয়ারে বসে সমুখের টেবিলে আনি-দুয়ানি-সিকি গুণে গুণে গোছাচ্ছেন।

আমাকে দেখেই বললে—'দাদা, আমি এই দশটার গাড়ীতে দিদির বাড়ী যাব। তা ব'লে আপনি চলে যাবেন না। যাবেন রাত সেই দশটায়।'

আমি বললাম—'দিদির বুঝি কোন ব্রত-প্রতিষ্ঠা আছে? তাই এত কাপড় নিয়ে যাচ্ছ, আর কাঙ্গালি-বিদায়ের জন্য ঐ আনি-দুয়ানি?'

শরৎ আমার দিকে চেয়ে বললেন—'না দাদা, দিদির ব্রত-প্রতিষ্ঠা নয়!' এই বলেই সে চুপ করল, আসল কথাটা গোপন করাটাই তাঁর ইচ্ছা।

১ সাহিত্যিক জলধর সেন।

আমি বললাম—'ব্রত-প্রতিষ্ঠা নয়, তবে এত নূতন কাপড়ই-বা নিয়ে যাচ্ছ কেন? অত সিকি-দুয়ানিরই বা কি দরকার!'

শরৎ অতি মলিন মুখে বললেন—'দাদা, দিদির গাঁয়ের আর তার চারপাশের গাঁয়ের গরিব-দুঃখীদের যে কি দুর্দশা! তাদের পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, চালে খড় নেই। সে যে কি—'

শরৎ আর বলতে পারল না; তার দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

এই আমার শরৎচন্দ্র।

এই শরৎচন্দ্রকে আমি ভালবাসি, ভক্তি করি।

এই শরৎচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি।

অনুশীলনী

১. শরৎচন্দ্র দিদির গাঁয়ে নূতন কাপড় আর সিকি-দুয়ানি নিয়ে যাচ্ছিলেন কেন?

রূপনারায়ণের তীরে

দুই জেলার মাঝ দিয়ে রূপনারায়ণ নদ বয়ে চলেছে। ওপারে মেদিনীপুর জেলা। এপারে হাওড়ার মাটি। এই মাটিতেই বাস করেন শরৎচন্দ্র।

সামতাবেড় ছোট গ্রাম, একেবারে রূপনারায়ণ নদের কিনারে। এখানেই বাড়ি তৈরি করেছেন তিনি। স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন।

এই বাড়ি তৈরির একটু ইতিহাস আছে। এ সম্পর্কে কবিশেখর কালিদাস রায় লিখেছেন ঃ

"যখন তিনি শিবপুর ছেড়ে সামতাবেড়ে বাস করতে যান—তখন তাঁর আর্থিক অবস্থা খুবই ভাল। তখন তিনি শিবপুরেই গৃহ-নির্মাণের সংকল্প করছিলেন।

সহসা একদিন শুনলেন, তাঁর ভগিনীর গ্রাম সামতাবেড়ে দারুণ দুর্ভিক্ষ হচ্ছে। তিনি তখনই ভাবলেন এই সময়ে ঐ গ্রামে একটা বড় বাড়ি করলে গ্রামের লোক খেটে অন্নোপার্জন করতে পারবে।

এইভাবে প্রায় বিশ হাজার টাকা খরচ করে একটি প্রকাণ্ড বাড়ি তৈরি করে বাস করতে গেলেন।

যে গ্রামে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ হয়—বেছে বেছে শরৎচন্দ্র সেই গ্রামেই বাস করতে গেলেন। যেরূপ আর্থিক অবস্থা হলে লোকে দুঃখী-কাঙালদের কাছ থেকে দূরে থাকতেই চায়—শরৎচন্দ্র সেই অবস্থায় গেলেন তাদের মধ্যেই বাস করতে। গ্রামের বহু লোক তাঁর গৃহে

আশ্রয় পেয়েছিল। সকলেই অল্পবিস্তর তাঁর দ্বারে সাহায্য পেয়েছিল।"

বাড়িটি কেমন ছিল দেখতে ?

এ সম্পর্কে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়[১] চমৎকার একটি বিবরণ দিয়েছেন ঃ

"সামতাবেড়-এ রূপনারায়ণের তীরে বাড়ি উঠল। দুতলা। টালির ছাদ। কিন্তু, সব মাটির দেওয়াল। বড় বড় ঘর। প্রশস্ত বারান্দা। নদীর দিকে বারান্দার কোণে একখানি ঘর। লেখবার আসর। বারান্দায় বিরাট আরাম চৌকী, ইজিচেয়ার। পাশেই গড়গড়া। সামনে প্রাঙ্গণে ফুলের বাগান। অদূরে কূলভাঙ্গা নদী। বিশাল জলরাশি। তারি বুকে দোলে ছোট ছোট নৌকা। পরপারে মসীমাখা তরুছায়া।"

অনুশীলনী

১. শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ে-তে কেন বাড়ি করেছিলেন ?

২. তাঁর বাড়িটির বর্ণনা দাও।

---

১. আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ছেলে

এক ওষুধে সেরে গেল

কবি নরেন্দ্র দেব লিখেছেন ঃ

"সামতাবেড়ে দরিদ্র গ্রাম। একজন ডাক্তার পাওয়া যায় না সহজে। শরৎচন্দ্র হোমিওপ্যাথি ও বায়োকেমিক চিকিৎসা যত্ন করে শিখেছিলেন দরিদ্রের সেবা করার জন্য। গ্রামের যত চাষাভূষো, দীন-দরিদ্র, কুলিমজুর সবার সঙ্গে তিনি ডেকে আলাপ করতেন। তাদের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করতেন। ছেলেমেয়ের অসুখ করেছে শুনলে চিকিৎসা করতেন। বিনামূল্যে ওষুধ দিয়ে তাদের ভাল করে তুলতেন। কিন্তু রোগীর পথ্য দরিদ্র গ্রামবাসীরা দিতে পারতো না। শরৎচন্দ্র নিজ ব্যয়ে তাদের পথ্যেরও ব্যবস্থা করতেন।

এমনি করে তিনি সারা গ্রামের 'দাদাঠাকুর' হয়ে উঠেছিলেন।"

শরৎচন্দ্র হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শেখা ও প্রয়োগ সম্পর্কে শরৎচন্দ্র নিজেই গল্প করেছেন।[১]

"বিদ্যে তো আয়ত্ত করা গেলো কিন্তু প্রয়োগ করি কার ওপর—পেসেণ্ট খুঁজতে লাগলাম। বাড়ীতে যারা আসে সবাইকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জিগ্যেস করি তাদের কিছু অসুখ করেছে কিনা। সবাই বলে —না, কিছু হয়নি।

—গরহজম ? মাথাব্যথা ? চোঁয়া ঢেকুর ? অম্বল ?

১ এই গল্পটি শরৎচন্দ্রের মুখে শুনে লিখেছেন বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সবাই বলে—না কোন অসুখই হয়নি।

বেজায় দমে গেলুম—কিন্তু রুগী খোঁজায় বিরত হলুম না—শেষে কি রুগী না পেয়ে এমন বিদ্যেটা মাঠে মারা যাবে!

যাই হোক অনেক চেষ্টা চরিত্তিরের পর বাড়ীর পেছন দিকের এক গয়লানীর অসুখ হতে একদিন আমার কাছে এলো। খুব ভাল করে দেখে-শুনে তাকে ওষুধ দিয়ে বললুম, দু'একদিন পরেই এসে আবার ওষুধ নিয়ে যেও বাছা—আর যদি তোমার কেউ জানাশুনো থাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো—এমনি ওষুধ দেব। কিন্তু সেই যে সে গেলো আর আসে না।

একদিন বাড়ীর পিছন দিকের জানালাটি খুলে দেখি—সে গোরুকে ঘাস খাওয়াচ্ছে। তাকে ডেকে বললুম, "হাঁ বাছা, তোমার সেই যে কি অসুখ করেছিল আমার কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে গেলে—আর আসো না কেন?

গয়লানী বললে, সেই খেয়েই সেরে গেছে আর দরকার নেই।

যা বাবা—এতো বললুম "অমনি চিকিৎসা করব, ওষুধ দেব তাতেও রুগী জুটল না, যাও-বা জুটল তাকে আর চিকিৎসা করতে হলো না, এক ওষুধে সেরে গেল।"

অনুশীলনী

১. শরৎচন্দ্র কি ভাবে সারা গ্রামের 'দাদা ঠাকুর' হয়ে ওঠেন?

২. শরৎচন্দ্রের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার অভিজ্ঞতা কি রকম?

গরম মুড়ি বেশ লাগে

শরৎচন্দ্রের বাজে-শিবপুরের বাসার প্রায় পাশেই এক মুড়িওয়ালী বাস করত। তার নাম বিরাজ এবং সে বিধবা ছিল। বিধবা বিরাজের কোন ছেলেমেয়ে ছিল না।

তার আয় বলতে ছিল মুড়ি ভাজা ও বিক্রি করা। মুড়ি ভেজে সে পাড়ায় পাড়ায় বিক্রি করত এবং এভাবেই কোন রকমে সংসার চালিয়ে নিত।

বিধবার এত আত্মসম্মান ছিল যে নিজের অভাবের কথা কাউকে সে কোনদিন মুখ ফুটে বলত না। সব অভাব-অভিযোগ আর দুঃখ-দারিদ্র্য সে মুখ বুজে সহ্য করত, অপরকে জানতে দিত না।

একদিন সে যখন মুড়ি বিক্রি করতে আসে তখন কথায় কথায় শরৎচন্দ্র তার অভাবের কথা জানতে পারেন। এবং এও জানেন যে, বিরাজ কারো কাছে কোন সাহায্য নেবে না। তাই তিনি স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীকে বললেন—

বড়-বৌ, প্রতিদিনই বিরাজের কাছে মুড়ি কিনো। গরম মুড়ি আমার খেতে বেশ লাগে। আমি তো খাবোই, তোমরাও সবাই খেতে পারো।

আসলে কিন্তু খাওয়ার জন্য নয়, বিধবা বিরাজকে পরোক্ষ সাহায্য করার জন্যই বড়-বৌ-এর প্রতি এই নির্দেশ।

নির্দেশ দিয়েই তিনি কিন্তু চুপচাপ ছিলেন না। রোজ রোজ মুড়ি কেনা হয় কিনা জানার জন্য মাঝে মাঝে বলতেন—

বড়-বৌ আজ যে মুড়ি কিনেছো, সেই টাট্‌কা মুড়ি থেকে এক মুঠো আমাকে দাও তো। চায়ের সাথে খেতে ইচ্ছে করছে।

হিরণ্ময়ী দেবী বাটিতে করে মুড়ি দিয়ে গেলে কিছুটা তিনি খেতেন বাকীটা খেত তাঁর আদুরে কুকুর—ভেলু।

শরৎচন্দ্রের এই পরোক্ষ সাহায্য বিরাজ কোনদিন বুঝতে পারেনি। বুঝতে পারেনি শরৎচন্দ্রের বাড়ীর লোকেরাও।

এই ঘটনা শুধু একটা নয়, শরৎচন্দ্রের জীবনে অনেক আছে এমনি গোপন-দান।

অনুশীলনী

১. 'শরৎচন্দ্রের জীবনে অনেক আছে এমনি গোপন দান।'—এই গোপন দানের পরিচয় দাও।

সুরোর ঐ রকমই কাজ

শরৎচন্দ্রের দিদি—অনিলা দেবী—গোবিন্দপুরে বাস করেন। গোবিন্দপুরের পাশেই সামতাবেড়ে গ্রাম। শরৎচন্দ্র তখনো সামতা-বেড়ের বাড়ি তৈরি করেন নি। তিনি বাস করেন বাজে-শিবপুরে ভাড়ার বাড়িতে।

এই সময় অনিলা দেবীর দুই দেওরের দুটি ছেলের একসঙ্গে পৈতা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

এই উৎসবে আত্মীয়-স্বজন সবাই এসেছেন। শরৎচন্দ্রও শিবপুর থেকে এসেছেন তাঁর দিদির বাড়িতে।

ভাইকে একবার একা পেয়ে অনিলা দেবী জিজ্ঞেস করলেন—সুরো[১], তুই কি উপহার দিবি? কিছুই তো তোর কাছে দেখছি না। টাকা দিবি বুঝি?

দিদির প্রশ্নে শরৎচন্দ্র উত্তর দিলেন—গরীব লেখক আমি। কি আর দেবো! মুখুজ্যে মশায়রা বড়লোক, জমিদার। তাঁদের উৎসবে কিছু না দিলেও চলে।

বিস্মিত হলেন অনিলা দেবী। বললেন—সে কি কথা? তা কখনো হয়! তোর কত নাম-ডাক। তুই তেমন কিছু না দিলে আমার মুখ থাকবে কেন?

১ শরৎচন্দ্রকে অনিলা দেবী 'সুরো' বলে ডাকতেন।

সে পরে দেখা যাবে। এই বলে তখনকার মত শরৎচন্দ্র সেখান থেকে সরে পড়লেন।

শেষে দেখা গেল—যাদের পৈতা হল সেই দুই ভাই জীবন আর ব্রজদুর্লভকে—শরৎচন্দ্র একটি করে দুটি আধলা বা আধ পয়সা[১] উপহার দিলেন। এ নিয়ে আত্মীয়-স্বজনেরা অনেকেই হাসাহাসি করতে লাগলেন।

শরতের এই কাণ্ড দেখে অনিলা দেবীর লজ্জার সীমা রইল না। শরৎচন্দ্রকে তিনি খুঁজতে লাগলেন।

ওদিকে শরৎচন্দ্র তাঁর ভগ্নীপতি পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের সাথে একান্তে কথাবার্তা বলছেন।

মুখুজ্যে মশায়ের সদর বাড়ীর সামনেই দুটো বড় বড় খড়ের গাদা দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাই দেখে শরৎচন্দ্র তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—অত বড় বড় দুটো খড়ের গাদা আপনার কি হবে? একটা গাদাই আপনার গরুগুলো খেয়ে শেষ করতে পারবে না। আমাকে একটা বিক্রি করে দিন না?

—এক গাদা খড় কিনে তুমি কি করবে?

—বিশেষ প্রয়োজন আমার। একটা গাদাতে ক'কাহন খড় হবে? কত দাম পড়তে পারে?

—একশ' টাকা তো পড়বেই। কিন্তু এত খড় তোমার কি দরকার বল তো?

—এই নিন টাকাটা। বলেই শরৎচন্দ্র একশ' টাকা পঞ্চানন মুখুজ্যের হাতে গুঁজে দিলেন।

১ সে সময় চালু ছিল। ৬৪ পয়সায় হতো এক টাকা বা ষোল আনা।

তারপর শরৎচন্দ্র সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে অদূরে ছুলে-পাড়ায় গেলেন। খোঁজ নিলেন সেখানে কার কার ঘরের চালে খড় নেই। তাদের বললেন—মুখুজ্যে মশায়ের বাড়িতে খড় কেনা আছে, তোরা নিয়ে আয়।

তাঁরা আগে থেকেই শরৎচন্দ্রকে জানতেন, চিনতেন। অভাবে কতবার তাঁর কাছে হাত পেতেছেন। তাই যাদের দরকার তারা হাসি মুখে খড় নিয়ে এল।

মুখুজ্যে মশায় সব শুনে স্ত্রীকে বললেন শরৎচন্দ্রের কাণ্ড।

হাসতে হাসতে অনিলা দেবী উত্তর করলেন—

ন্যাড়ার ঐ রকমই কাজ।

অতিথিরা যাঁরা আগে হেসেছিলেন শরৎচন্দ্রের আধ-পয়সা দেওয়া দেখে, তারা তো একেবারে থ'।

অনুশীলনী

১. দিদির দেওরের দুই ছেলের পৈতেয় শরৎচন্দ্র কি উপহার দিয়েছিলেন? সেই উপহার কেন দিয়েছিলেন?

২. একশ' টাকার খড় কিনে তিনি কি করেছিলেন? এই দুটি ঘটনা থেকে তোমরা কি বুঝতে পারলে?

রাজা হও বাবা

"একদিন তাঁর[১] সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে চলেছি গড়িয়াহাটা বাজারের দিকে। তাঁর কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কেনবার দরকার ছিল। শীতকাল। বৃষ্টির সময় নয়। কিন্তু সেদিন টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছিল।

আমার ছাতা ছিল সঙ্গে। দুজনেই সেই ছাতা মাথায় দিয়ে চলেছি। গড়িয়াহাটার মোড়ের কাছে আসতে একটি বৃদ্ধা ভিখারিণী আমাদের সামনে হাত পেতে দাঁড়ালো। পরিধানে ছিন্নবস্ত্র। বৃষ্টিতে ভিজে লেপটে আছে গায়ে। শীতে বুড়ি কাঁপছিল।

শরৎচন্দ্র তার অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি পকেট থেকে তাঁর মানি-ব্যাগ বার করে তার মধ্যে যা ছিল সব উপুড় করে বুড়ির হাতে ঢেলে দিলেন।

আন্দাজে মনে হল খুচরো পয়সা সিকি দুয়ানী টাকা ও নোটে সে নেহাৎ কম হবে না। গোটা পনেরো-কুড়ি টাকা তো বটেই।

আমি[২] তো অবাক। বুড়ি ভিখারিণীও অবাক।

আমার দিকে একবার এবং শরৎচন্দ্রের দিকে একবার চেয়ে সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

---

১ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২ কবি নরেন্দ্র দেব

অতগুলো টাকা নিতে সাহস হচ্ছিল না তার। ভাবছিল হয়তো ভুল হয়ে গেছে কিছু।

আমিও আমার বিস্ময়-অভিভূত অবস্থা যাবার পর বলতে যাচ্ছিলাম শরৎদাকে—এ আপনি কী করছেন ?

কিন্তু তার আগেই শরৎচন্দ্র ভিখারিণীকে বললেন—মা, এ টাকায় তোমার যে কদিন চলে, সে কদিন আর ভিক্ষায় বেরিও না। একে শীত, তাতে বৃষ্টি নেমেছে, ঠাণ্ডায় তুমি কাঁপছো।

দেখো, আমি রোজ এদিকে বেড়াতে আসি। টাকাকড়ি ফুরিয়ে গেলে আবার তুমি এসে দাঁড়িও এই মোড়ে, আমি আবার কিছু দেবো। আজ আমার সঙ্গে এর বেশি আর কিছু নেই।

বুড়ি—'রাজা হও বাবা, বেঁচে থাকো, ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক' —বলে ধীরে ধীরে চলে গেল।

আর আমি ?

আমার সমস্ত অন্তর এই দরদী মানুষটির পায়ে অসীম শ্রদ্ধায় লুটিয়ে পড়লো।"

অনুশীলনী

১. ভিখারিণীকে শরৎচন্দ্র কি ভিক্ষা দিয়েছিলেন ? কেন দিয়েছিলেন ?

শরৎচন্দ্র ও দুটি চোর

সেদিন রবিবার। আমরা দুজনে[১] সকাল সাড়ে ন'টা আন্দাজ সময় অশ্বিনী দত্ত রোডে গিয়েছি। গিয়ে দেখি, তখনও শরৎদা এক-তলার বৈঠকখানায় নামেননি। রবিবার সকাল-সকাল বৈঠকখানায় নামতেন। চাকর বললে—এখনও ওঠেননি, শুয়ে আছেন।

অসুখ করেছে মনে করে উদ্বিগ্ন মনে দুজনে আমরা দোতলায় উঠে গেলুম। তাঁর শোবার ঘরের দরজার মুখে বাড়িশুদ্ধ লোকের জটলা। ফিস্‌ফিস্ কথাবার্তা।

—কী ব্যাপার ?

প্রকাশবাবু[২] নীচু গলায় বললেন—মুশকিল হয়েছে। কাল শেষ রাত্রে দুটো চোর বাড়ির সামনে ধরা পড়েছিল। তাদের পুলিশে দেওয়া হয়েছে—সেই দুঃখে দাদা বিছানা নিয়েছেন। একটু কৌতুকের সুরেই বললেন যদিও, তবুও তাঁর বেশ উদ্বেগ হয়েছে, বোঝা গেল।

বৌদি (হিরণ্ময়ী দেবী) ব্যগ্র হয়ে আমার স্বামীকে বললেন—ঠাকুরপো, তোমরা দুজনে এসে পড়েচ, খুব ভাল হয়েছে। কিছুতেই তো তোমার দাদাকে ওঠানো যাচ্চে না। চা দেওয়া হয়েচে,—পড়ে আছে, তামাক পর্যন্ত পুড়ে পুড়ে নিবে গেল। তোমরা একটু ভেতরে গিয়ে দেখ না, যদি ওঠাতে পার।

কাহিনীটি এই,—ভোর রাত্রে বাড়ির সামনে রাস্তায় হৈ-চৈ চেঁচামেচি শুনে ঘুম ভেঙ্গে যায়। উনি উঠে নিচে নেমে যান। গিয়ে

১ লেখিকা রাধারাণী দেবী ও তাঁর স্বামী কবি নরেন্দ্র দেব।

২ শরৎচন্দ্রের ছোট ভাই।

দেখেন ওদের বাড়ির ঠিক সামনেই, ছুটো অল্প-বয়সী ছেলেকে পাড়া-শুদ্ধ লোকে দারুণ ঠেঙাচ্ছে, তাদের চোখ-মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

তিনি তাড়াতাড়ি গেট খুলে বেরিয়ে চোর ছুটিকে ক্রুদ্ধ জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে বাড়ির মধ্যে টেনে এনে গেট বন্ধ করে দেন। জনতা এতে আরো রেগে যায়, আপত্তি করতে থাকে। তাদের হাতে ওদের ফিরিয়ে দিতে বলে।

শরৎচন্দ্র তাদের বলেন—বামাল যখন ধরা পড়েছে তখন ওদের পুলিশে দিতে পার তোমরা, কিন্তু খুন করে ফেলতে পার না।

তখন পাড়ার লোকেরা শরৎদার বাড়ির দোতলায় উঠে এসে পুলিশে খবর দেয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে বামাল চোর ছুটিকে পাওয়া যাবে পুলিশ স্টেশনে বলে দেওয়া হয়।

চোর ছুটির চোখমুখ তখন ভিমরুল কামড়ানোর মতন ফুলে উঠেছে। উনি নিজে তাদের আইডিন তুলোটুলো এনে শুশ্রূষা করেছেন। খুবই কাতর হয়ে পড়েছেন তাদের জন্য। ছু-গেলাস গরম চা বানিয়ে দেবার হুকুম করেছেন।

এদিকে চোরেরা কিন্তু ওঁর ছুই পা জড়িয়ে কান্না শুরু করেছে—'আমাদের পুলিশে দেবেন না বাবু যত খুশি আপনারাই মারুন। আর কখনও এমন কাজ করবো না।'

কিন্তু তখন তো আর উপায় ছিল না। একটু পরেই পুলিশের গাড়ি এসে ছেলে ছুটোকে ধরে নিয়ে চলে গেল। পাড়ারই পণ্ডিতিয়া বস্তির ছেলে ওরা।

সেই থেকে উনি বিছানায় শুয়ে পড়েছেন। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। বলছেন—আমিই ছেলে ছুটোর জীবনের সর্বনাশ করে দিলুম!

ভাগ্যিস জামা পুড়েছিল

শরৎচন্দ্র তখন তাঁর বালিগঞ্জের বাড়িতে বাস করেন। একদিন বিকেলের দিকে ট্রামে বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ির কাছাকাছি ট্রাম-স্টপ আসার আগেই তিনি সিট থেকে উঠে এসে গেটের কাছে দাঁড়ালেন।

এমন সময় একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক তাঁর পাশে বসে থাকা যুবকটিকে অভিযোগ করলেন—

বলি খুব তো তন্ময় হয়ে বই পড়ছেন মশায়—এদিকে যে আপনার হাতের জ্বলন্ত সিগারেট আমার নতুন জামা পুড়িয়ে দিল, সে হুঁস নেই ?

যুবকটি বইটা মুড়ে পৌঢ় ভদ্রলোককে বললেন—অন্যায় হয়েছে, ক্ষমা করবেন। সত্যিই বইটা পড়তে পড়তে বইয়ের মধ্যে এমনি ডুবে গেছলাম যে, খেয়ালই ছিল না হাতে সিগারেট আছে।

শরৎচন্দ্র যুবকটির দিকে তাকাতেই দেখলেন—তার হাতে যে বইটি রয়েছে সেটির লেখক তিনি নিজেই অর্থাৎ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ইতিমধ্যে স্টপেজে ট্রাম এসে থামল। শরৎচন্দ্র নেমে পড়লেন। নামবার সময় বললেন—

জামা পোড়ানোর জন্যে যুবকটি দায়ী নয়। দায়ী আমিই।

ট্রামের গেটের কাছে আর যারা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের কেউ কেউ

শরৎচন্দ্রকে চিনতেন। তাঁর ছবি দেখেছেন অনেকেই। তাঁরা সেই যুবকটির হাতের বই-এর দিকে তাকালেন—লেখক হলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ট্রামে তাঁরা খেয়াল করেন নি। এখন চিনতে পেরে একজন বললেন—

ওই তো শরৎচন্দ্র নেমে গেলেন। ওঁর বই-ই অমন তন্ময় হয়ে পড়ছিলেন বলে উনি ও-কথা বলে নেমে গেলেন।

যিনি বই পড়ছিলেন এবং যাঁর জামা পুড়েছিল, তাঁরা দুজনেই শরৎচন্দ্রকে চেয়ে দেখতে লাগলেন। প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন—ভাগ্যিস জামাটায় আগুন ধরেছিল, তাইতো তাঁকে দেখতে পেলাম।

অনুশীলনী

১. 'আমিই ছেলে দুটোর জীবনের সর্বনাশ করে দিলুম!'—একথা কে, কেন বলেছিলেন? তাঁর এই আফশোষের কারণ কি?

২. 'ভাগ্যিস জামাটায় আগুন ধরেছিল'—একথা কে, কেন বলেছিলেন? জামায় আগুন-ধরাকে তিনি 'ভাগ্যিস' বলেছিলেন কেন?

চিরকাল এই করে আসছি

"একদিনের কথা মনে পড়ে, সঙ্গে ছিলেন অসমঞ্জবাবু। সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার বিয়ে। তখন বরানগরের নিকটবর্তী একটি গ্রামে ছিল তাঁর অস্থায়ী নিবাস।

সেদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হচ্ছিল। শরৎচন্দ্রের হয়েছিল দাঁতের যন্ত্রণা।

আমি[১] বললাম—'দাদা, অতদূরে এই বর্ষায় আর গিয়ে কাজ নেই। হাতে করে ত গাল চেপে রয়েছেন। অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে বাড়ী খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে।'

শরৎচন্দ্র বললেন—'বল কি! চারুর মেয়ের বিয়ে! ঢাকায় নয়, কলকাতার কাছেই। না গেলে কি চলে? যেতেই হবে। তুমি কি বলতে চাও—বৃষ্টিবাদল বলে বর যাবে না, বরযাত্রীরা যাবে না, আর কন্যাযাত্রীরা কেউ যাবে না? তারা যদি যেতে পারে, আমরাও পারব। দাঁতে বেদনা ভারি একটা অজুহাত। দাঁত থাকলে তাতে একটু-আধটু বেদনা থাকে, চলো।'

নিমন্ত্রণ বাড়ীর কাছাকাছি এসে সদর রাস্তার উপর মোটর দাঁড়াল, নেমে গলি খুঁজে নেওয়া হল। গলিতে এক হাঁটু জল দাঁড়িয়েছে। মোটর পাকা রাস্তায় রেখে হেঁটে যেতে হবে।

---

১ কবিশেখর কালিদাস রায়।

অসমঞ্জবাবু বললেন—'আর তো যাবার উপায় নেই, ফিরেই যেতে হল।'

শরৎচন্দ্র বললেন—'তোমরা বড় শহুরে বনে গেছ। পাড়া-গাঁ হলে কি করতে? এতদূরে এসে ফিরে যাব, বল কি?'

জুতো হাতে করে জল-কাদা ভেঙ্গে চলতে হল। পথে এক জায়গায় সুরকি-গাদা ছিল তাতে গায়ের বর্ণ রাঙা হয়ে গেল।

শরৎচন্দ্র বললেন—'চিরকাল এই করে আসছি। পাড়া-গেঁয়ে লোক আমি। সহসা বাবু বনে যাব কি দুঃখে? তোমাদেরই কষ্ট দিলাম, আমার কোন কষ্ট হয় নি।'

অনুশীলনী

১. কিভাবে শরৎচন্দ্র সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার বিয়েতে যোগ দিয়েছিলেন?

২. 'চিরকাল এই করে আসছি।'—এই কথাগুলি বলার কারণ কি?

শরৎচন্দ্র তখন সপরিবারে কলকাতায় বসবাস করেন। একদিন বিকেলের দিকে অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি শরৎচন্দ্রকে খুবই শ্রদ্ধা করেন এবং তাঁর বিশেষ অনুগত।

সেদিন শরৎচন্দ্র তাঁকে বললেন—চল একটু বাজারের দিক থেকে বেড়িয়ে আসি।

"অসমঞ্জকে নিয়ে মোটরে করে জগুবাবুর বাজারে এলেন। বাজারে এসে এটা ওটা করে অনেকগুলো জিনিস কিনলেন। কিনে শেষে বললেন—দেখ অসমঞ্জ, একটা জিনিস বাড়ি থেকে বলেছিল নিয়ে যেতে। জিনিসটার নাম তো মনে পড়ছে না। শুধু মনে আছে জিনিসটা উপকারী এবং দরকারী, ভিজিয়ে খেতে হয়।

অসমঞ্জবাবু শুনে বললেন—মিছরি কি?

—না।

—তবে বাতাসা?

—না, না, ওসব নয়।

—ছোলা?

—না, তাও নয়।

—তাহলে কাঁচা গোটা মুগ কি বরবটি কলাই বোধহয়। কোন পূজার নৈবিদ্যির জন্যে তো?

—বোধ হচ্ছে ছোলাই হবে।

এই বলে একটু চিন্তা করে আবার বললেন—তাই-বা কেমন করে

হবে ? আজ সকালেই তো ছোট ধামার আধ ধামা ছোলা ভাঁড়ারে দেখেছি।

এবার অসমঞ্জবাবু বললেন—দাদা ইসবগুল কি ?

এই শুনেই শরৎচন্দ্র প্রায় লাফিয়ে বলে উঠলেন—চিঁড়ে! চিঁড়ে!

তখন শরৎচন্দ্র এক চিঁড়ের দোকানে গিয়ে সের আড়াই চিঁড়ে কিনলেন। তারপর অসমঞ্জবাবুকে সঙ্গে নিয়ে মোটরে বাড়ি ফিরলেন।

পরের দিন সকালে অসমঞ্জবাবু আবার শরৎচন্দ্রের কাছে আসেন। তখন শরৎচন্দ্র বৈঠকখানায় বসে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁকে দেখেই বলে উঠলেন—

তোমার কথায় কাল চিঁড়ে কিনে বাড়িতে কি বকুনিটাই না খেলাম হে।

—তাহলে চিঁড়ে নয় ? তবে কি ?

—নালতে পাতা। ছেলেমেয়ে দুটোর কৃমি হয়েছে। ওদের পিত্তি বেড়েছে। সব ভিজিয়ে দিন কতক খাবে। উঃ ওর জন্যে কাল কি কথাটাই না শুনতে হ'ল।

—দাদা চিঁড়ের কথা আমি তো বলিনি! আমি বলেছিলাম, ইসবগুল ; আমি বরং ওর কাছাকাছিই গিয়েছিলাম।

—ওঃ চিঁড়ে তুমি তাহলে বলনি! আমিই বলে কিনেছিলাম। যাক! সব সময় সব কথা মনেও থাকে না! বলে গড়গড়ায় তামাক টানতে লাগলেন।" *

---

* গোপালচন্দ্র রায়।

মৃত্যুহীন প্রাণ

রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে শরৎচন্দ্রকে লিখেছেন ঃ

কল্যাণীয়েষু,

শরৎ, রুগ্ন দেহ নিয়ে তোমাকে হাসপাতালে আশ্রয় নিতে হয়েছে শুনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলুম। তোমার আরোগ্য লাভের প্রত্যাশায় বাংলাদেশ উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকবে। ইতি ৩১।১২।৩৭

বাংলাদেশ সত্যই উৎকণ্ঠিত হয়ে ছিল।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় প্রভৃতি শরৎচন্দ্রকে দেখে স্থির করলেন, পেটে অস্ত্রোপচার করা ছাড়া আর উপায় নেই।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের নির্দেশে সেই সময়কার বিখ্যাত সার্জন ললিত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রকে অপারেশন করলেন।

অপারেশন করেও কিন্তু শরৎচন্দ্রকে বাঁচানো সম্ভব হল না।

অপারেশনের চারদিন পর সবার সব চেষ্টা ব্যর্থ করে পার্ক নার্সিং হোমে শরৎচন্দ্র চোখ বুজলেন, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

সেই তাঁর চিরনিদ্রা, অমরধামে যাত্রা।

সময় তখন সকাল দশটা বেজে দশ মিনিট। রবিবার ২রা মাঘ, ১৩৪৪ সাল। ইংরেজি ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ।

মৃত্যুর সাত মিনিট পরে এই দুঃসহ দুঃসংবাদ বেতারের মাধ্যমে দিকে দিকে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর ৪ মাস।

বাঙলা তথা ভারতের দুর্ভাগ্য। যদি আরো কিছুদিন বাঁচতেন, তাহলে তাঁর হাত থেকে আমরা কতই-না অমূল্য সম্পদ পেতাম। তবু তিনি মৃত্যুহীন।

১২ মাঘ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ লিখলেন ঃ

যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি।

অনুশীলনী

১. শরৎচন্দ্রকে আপন-ভোলা মানুষ ছিলেন তা একটি কাহিনী বর্ণনা করে বুঝিয়ে দাও।

২. শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর সময় কে কি করেছিলেন এবং বলেছিলেন? তাঁর মৃত্যু উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ কি লিখেছিলেন?

জিতেন